OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 993 - 1001
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঔপনিবেশিক আমলে বীরভূম জেলার শিল্প : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৮৫৫-১৯৪৭)

নিখিল বাউরী
Email ID: baurinikhel@gmail.com
0009-0002-7952-3922

Received Date 30. 03. 2026
Selection Date 07. 04. 2026

Keyword
Birbhum industries, Colonial Bengal economy, Silk production Surul, Iron smelting Rampurhat, Lac industry Erskine, Leather tanning Nalhati, Cottage industries decline, Zamindari exploitation, Deindustrialization 19th century, Terracotta crafts Birbhum, Sericulture Murarai, British raw exports.

Abstract
Birbhum district in colonial Bengal sustained a diverse array of cottage and small-scale industries from 1855 to 1947, harnessing local resources like silk, Tasar, iron ore, lac, hides, clay, and forest products. These sectors underpinned the rural pre-industrial economy, integrating artisanal skills with agriculture amid Permanent Settlement pressures and growing export demands. British policies favoring raw material extraction over local manufacturing caused stagnation, exacerbated by zamindari exploitation, fuel scarcity, technological lag, and competition from Manchester textiles and imported metals. Silk production remained prominent, especially post-1857 Revolt when local sericulture gained traction. Centers like Surul, Gunutia, Doyarki, Bhola, and Moudeshwar-to-Murarai produced thousands of handloom saris daily from 5,000–6,000 maunds of raw silk annually—a uniquely scaled household industry in India, though British merchants like John Chip's earlier networks influenced late-19th-century trade. Iron smelting persisted around Rampurhat in Belya, Narayanpur, Deucha (with 30 furnaces), and Ganpur, relying on local ore. British attempts, such as Barnes and Co.'s 1875 foundry, failed within years due to raw material shortages and costs, reducing operations to polishing scrap by the 1880s–90s, as documented in district gazetteers. Leather tanning thrived in Rampurhat and Nalhati, processing hides from cattle, wild animals, for regional markets. The lac industry, crucial for shellac, dyes, toys, and jewelry, continued via consolidated units like Erskine and Co.'s legacy from 1787, enduring 50–60 years into the early 20th century. Metal crafts in Dubrajpur, Nalhati, and Sainthia crafted brass utensils, scissors, and knives, while terracotta pottery flourished in rural households. This era's decline reflected colonial deindustrialization, pushing artisans toward agrarian labor—a precursor to post-1947 land reforms and agricultural shifts in Birbhum. Remnants like Kantha embroidery and Bakreshwar pottery highlight enduring cultural resilience.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : সাম্প্রতিক সময়ে 'স্থানীয় ইতিহাস' ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হিসাবে আগ্রহ বেড়েছে। গত কয়েক দশকে আমাদের দেশে এর উপর বই এবং প্রবন্ধগুলির একটা রচনা সংকলন উঠে এসেছে। এমনকি সাবালটার্ন গোষ্টির ঐতিহাসিকরা স্থানীয় ইতিহাসের সাবধানে তদন্ত করেছেন। জাতীয় ইতিহাস সর্বদা স্থানীয় বৈচিত্র্যের উপর আলোকপাত করতে পারে না। ইতিহাস কোনো প্রতক্ষ্যজ জ্ঞান নয় এবং বিজ্ঞানের মত ইতিহাস কোন সাধারণ আইন তৈরি করতে পারে না। তাই জাতীয় অনুশীলন অনেক সময় স্থানীয় বৈচিত্র্যকে অস্পষ্ট করে দেয়। যে অঞ্চলটির সম্বন্ধে গবেষণা করা হবে সেই অঞ্চলটির সম্বন্ধে জ্ঞান বিভিন্নভাবে বিবেচনা করে নিতে হবে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং এগুলির সম্পর্কে (স্থানীয় অনুশীলন) জ্ঞান অর্জনের ফলে একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবির্ভূত হয়। স্থানীয় ইতিহাস এই প্রক্রিয়া পূরণ করতে ব্যাপক সাহায্য করে। অন্য কথায় স্থানীয় ইতিহাস সাবধানে তদন্ত ও বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ ইতিহাস গঠন করে।[১]

বীরভূম জেলা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তদন্তের প্রথম প্রচেষ্টা নয়। যে সমস্ত পণ্ডিতদের বীরভূম জেলার নিয়ে শ্রমসাদ্য গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বীরভূম জেলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণা, রঞ্জন কুমার গুপ্তের জেলার সমাজ ও অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা, গৌরিহর মিত্রের গ্রামীন জনজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান। এছাড়াও বরুণ রায়, মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, অমিয় ঘোষ ও পার্থশঙ্খ মজুমদারের নাম বীরভূম জেলার গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কাজগুলি বীরভূমের শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছে এবং এই অঞ্চলে আরও গবেষণা করার আগ্রহ তৈরি করেছে। তবে উল্লিখিত পণ্ডিতগণ শিল্পের যেসমস্ত দিক আলোচনা করেছেন তার বাইরে এই প্রবন্ধে কয়েকটি নতুন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যেকোনো কাজ যথাযথভাবে করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বা রীতি অনুসরণ করতে হয়। এই প্রবন্ধটির ক্ষেত্রে প্রথমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে সমসাময়িক শিল্পের অবস্থা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মহাফেজখানা থেকে প্রাথমিক উৎসগুলি অধ্যয়ন করে গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রধান ও অপ্রধান উভয় উৎসগুলি থেকে জানা-অজানা তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে সতর্ক পরীক্ষণ এবং গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার বর্ণনামূলক রীতিতে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে, যা প্রবন্ধটিকে একটি সৃষ্টিশীল নমুনার মর্যাদা অর্জন করতে সাহায্য করেছে।

এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করার জন্য মুখ্য ও গৌণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা (কোলকাতা), জাতীয় গ্রন্থাগার (কোলকাতা), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (কোলকাতা), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (বর্ধমান) ও বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার থেকে। এছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি সমসাময়িক পত্রিকা, কিছু সংবাদপত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করেছে। যেকোন অঞ্চল তথা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে সঠিক তদন্ত ও বিশ্লেষণ করে স্থানীয় ইতিহাসের দ্বারা দীর্ঘ ইতিহাস গঠন করা যায়। আমার এই প্রবন্ধটি বাংলার সামগ্রিক শিল্পের ইতিহাসকে অনুধাবন করতে উপযোগী হয়ে উঠবে।

বীরভূম জেলাটি কৃষি সর্বস্ব জেলা, কিন্তু শুধু কৃষির সাহায্যে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। কৃষি ও শিল্প দুইয়ের সামঞ্জস্যের ওপরেই দেশের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য নির্ভর করে। শিল্পের শিক্ষা ও দক্ষতা অনুসারে নানা প্রকারের দ্রব্য তৈরি করে কৃষক তার বছরের কর্মহীন নয় মাস এবং বেকার তার বছরের কর্মহীন বারোমাসকে উর্বর করে তুলতে পারে।[২] বীরভূম অন্যান্য সকল জেলা অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বিশেষভাবে শিল্পের ও সাহিত্যের দিক দিয়ে একসময় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। শিল্প বলতে এমন কিছুই নাই, যা বীরভূমে ছিল না। তার অনেকগুলি নষ্ট হলেও এখনও তার প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। জেলাটি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। লোহা, কয়লা, তসর, রেশম, গালা, কাঁসা, পিতল, চিনি, মৃৎ, চর্ম ও অন্যান্য নানাবিধ শিল্পে বীরভূম যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এতগুলি শিল্পের সমাবেশ আর কোন জেলায় পাওয়া যায় না। তবে দিন সমান যায় না। অর্থের অভাবে ও বিদেশিদের আগমনে জেলার শিল্পগুলোর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবনতি ঘটেছে। বিদেশিদের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে জেলার শিল্পীগণ তাদের পূর্বপুরুষ পরিচালিত শিল্পগুলি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে নানা অসুবিধার কারণে শিল্পগুলোর অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু কালক্রমে অনেকগুলি শিল্প আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।[৩]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার কৃষির পরেই অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল বয়ন শিল্প। বিশেষ করে বস্ত্র বয়ন শিল্প। সাধারনত দু'রকম পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপন্ন হত কুটির ও ফ্যাক্টরি। কোম্পানি, বিদেশী বণিক ও এদেশি বণিকরা নিজেদের মূলধনে ও পরিচালনায়, নিজেদের কারখানায় শ্রমিক রেখে বস্ত্র উৎপাদন করত। অন্যদিকে বণিকদের কাছ থেকে মূলধন আগাম নিয়ে এদেশি তাঁতিরা নিজেদের বাড়িতে পরিবারের সকলে মিলে বস্ত্র উৎপাদন করত। আবার কেউ কেউ উনিশ শতকে বাংলার শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) অল্প পুঁজির কারিগর, যিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে পণ্য উৎপাদন করেন এবং নিজেই বিক্রি করেন। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কারিগর, যিনি উৎপাদনের জন্য আগাম নেন এবং নির্দিষ্টমানের পণ্য পূর্ব নির্ধারিত দামে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরকম উৎপাদন ব্যবস্থায় দালাল বা পাইকারের হাতে কারিগরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হত। (গ) পুঁজিপতি উৎপাদক, যিনি কারখানা করে কারিগর রেখে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন। এরকম উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম বিভাজন নীতি স্বীকৃতি পায় এবং দালাল বা পাইকারের হস্তক্ষেপ নেই।[৪]

বাংলায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার আগে তুলা শিল্পের সংগঠন ছিল পুরোপুরি কুটির ভিত্তিক। তখন ক্ষুদ্র এবং স্বাধীন উৎপাদনকারীগণ নিজ পরিবারের সদস্যদের শ্রমে উৎপাদন চালিয়ে যেতেন, অবশ্য মাঝে মাঝে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকও নিয়োগ করতেন। গোড়াতে তেমন কোন শ্রম বিভাজন ছিল না এবং প্রধান উৎপাদনকারীকে, লগ্নীকারী এবং ব্যবসায়ী উভয় ভূমিকায় পালন করতে হত। অন্যদিকে ঘরোয়া ব্যবস্থাপনায় প্রধান কারুশিল্পী মহাজনদের মূলধনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই মহাজনেরা প্রায়ই ঋণদান এবং কাপড়ের ব্যবসাকে সংযুক্ত করে নিত। মহাজনেরা মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে টাকা আদান-প্রদান করত। মধ্যস্বত্বভোগীদের বলা হত পাইকার। পাইকারদের অধস্তন একধরনের কর্মচারী ছিল, যাদের বলা হত 'মুকিম'। এরা ঘুরে ঘুরে উৎপাদিত বস্তুর গুণ এবং মানের তদারকি করত। ইউরোপীয়দের ভারতে আগমনের পর কুটির ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা আরও প্রসার লাভ করে। সেই সময় প্রায় সকল ভারতীয় কারুশিল্পীরই মূলধনের প্রচণ্ড অভাব ছিল। তাই যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যসংগ্রহের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনকারীদের অগ্রিম টাকা প্রদান না করে বিদেশি ব্যবসায়ীদের গত্যন্তর ছিল না।[৫]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁতিদের অগ্রিম প্রদান করত। এই দু'টি পদ্ধতি ছিল চুক্তি এবং এজেন্সি ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোম্পানি ভারতীয় যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করত সেই ব্যবসায়ীদের বলা হত 'দাদনি' ব্যবসায়ী। এরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করত। এরা আবার তাঁতিদের সঙ্গেও চুক্তি সম্পাদন করত এবং তাদের অগ্রিম বা দাদন প্রদান করত। দাদনি ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে সরবরাহ করছে বলে অভিযোগ আসতো।[৬] এই প্রেক্ষিতে ১৭৫৩ সালে চুক্তি ব্যবস্থা রহিত করা হয়। আসলে ইংরেজরা কখনো একটা জিনিসের ন্যায্যমূল্য দিতো না। আবার বায়নাকৃত পণ্য নেবার বেলায়ও এরা ছিল মাত্রারিক্ত খুঁতখুঁতে। এ জন্য ১৭৪০ সালের পর থেকে দাদনি ব্যবসায়ীরা ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ব্যবসা করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বরং ফরাসি ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক শর্ত তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষনীয় ঠেকে। তখন অনেক ক্ষেত্রে তারা ইংরেজ কোম্পানির আরপিত শর্ত মেনে নিতে অসম্মতি প্রকাশ করে।[৭]

১৭৫৩ সালে যে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তার নাম 'এজেন্সি ব্যবস্থা'। এই ব্যবস্থায় কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মকর্তারা কোম্পানীর নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁতিদের অগ্রীম প্রদান করত। তাঁতিদের সাথে চুক্তির শর্তগুলো যেন যথাযথভাবে পালিত হয় সেটা তদারক করার জন্য তারা ফ্যাক্টরির অধীনে প্রত্যেক 'আড়ং'-এ বেশ কিছু ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করে। এসব কর্মচারী 'গোমাস্তা', 'সেরেস্তাদার', 'মুহুরি', 'মুকিম', প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। কখনো কখনো অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োগ করা হত। তাদেরকে অভিহিত করা হত 'আমিন', 'নায়েব-গোমস্তা', 'নায়েব', এবং 'তহবিলদার', 'জমাদার', 'বরকন্দাজ' ও 'পিয়ন' নামে। গোমস্তা ছিল 'আড়ং'-এর প্রধান কর্মকর্তা। তার মাধ্যমেই অগ্রিম প্রদান এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংগ্রহের কাজ হত। গোমস্তাদের মাধ্যমেই প্রায় ফ্যাক্টরির সব কেনাকাটা পরিচালিত হত। এসব কর্মচারী নিয়োগের শর্ত দ্বারাই কোম্পানির প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা হত। তারাই ছিল কোম্পানির কর্তৃত্বের প্রতিভূ। দাদনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে তাঁতিরা যে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তা এভাবে গোমস্তাদের সঙ্গে কোম্পানির একচেটিয়া সম্পর্কে পরিণত হয়।[৮]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এককালের কর্মকর্তা উইলিয়াম বোল্টস তাঁর কন্সিডারেশনস অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স গ্রন্থে গোমস্তারা কিভাবে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ করত তার এক প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। এই গ্রন্থ থেকে গোমস্তাদের আচরণ সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি লিখেছেন; সে (গোমস্তা) তাদের (তাঁতিদের) দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং মূল্যে একটি নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য সরবরাহের শর্তে বন্ড সই করিয়ে নিতো এবং তাদের প্রাপ্য টাকার একটা অংশ অগ্রীম প্রদান করত। দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতিদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির তারা পরোয়া করত না। কোম্পানির ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার পর গোমস্তরা প্রায়শই তাঁতিদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতো; এবং তাঁতিরা প্রস্তাবিত শর্তে আগাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাদের কোমরে বেঁধে দেওয়া হত এবং বেত্রাঘাত করে তাদের বিদায় করা হত। এসব তাঁতিদের অনেকের নামই গোমস্তারা সাধারণত কোম্পানির খাতায় রেজিস্ট্রি করে রাখত। এবং তাদেরকে অন্যকারো অধীনে কাজ করতে দেওয়া হত না। বরং ক্রীতদাসের মতো তাদেরকে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করা হত। পরে গোমস্তা সুবিধা মতো খাতার আয়োজন করে প্রতিটি বস্ত্রখণ্ডের শ্রেণীবিভাগ করে মূল্য নির্ধারণ করত। এ কাজে যাচনদার নামে কোম্পানির একজন কর্মচারী নিয়োজিত থাকতো। এ বিভাগে যে কি পরিমাণ হঠকারিতার আশ্রয় নেয়া হত তা কল্পনাতীত। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভীষণ ভাবে ঠকতো গরিব তাঁতিরা। কারণ কোম্পানির গোমস্তারা এবং তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যাচনদারেরা পন্যের যে দাম নির্ধারণ করতো তা সর্বত্রই খোলা বাজারের চেয়ে অন্ততপক্ষে শতকরা পনেরো ভাগ এবং কোথাও কোথাও শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত কম ছিল। এজন্য ন্যায্যমূল্য প্রত্যাশী তাঁতিরা গোপনে অন্যের কাছে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় করার চেষ্টা করত। তাই কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতিদের পাহারা দেয়ার জন্য তাদের পিওন নিয়োজিত করত। এবং প্রায়শই বুননের শেষ পর্যায়ে তাঁত থেকে বস্ত্র কেটে নিতো।[৯]

বয়ন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত বস্ত্র এবং বৈদেশিক ও আঞ্চলিক ব্যবসার জন্য উৎপাদিত বস্ত্রের মধ্যে গুনগত পার্থক্য ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত বস্ত্র ছিল মোটা এবং দামে সস্তা। কাপড়ের মান ও মূল্য জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরি করা হত খুব যত্নের সঙ্গে, ব্যবসায়ীদের নমুনা অনুসারে। তবে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত বস্ত্রের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সুপষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যেত।[১০] যেমন বীরভূমের ইলামবাজার থেকে ইউরোপে সরবরাহ করা হত বিপুল পরিমাণ গড়া সুতিবস্ত্র। তিন শ্রেণীর সুতো থেকে তৈরি হত তিন-শ্রেণীর গড়া কাপড়। প্রথম শ্রেণী বা অতিমিহি। ভাগ করা হত এ, বি, ও সি উপশ্রেণীতে। প্রতি থানে এদের পার্থক্য ছিল আট আনা। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর গড়া সাধারণত বিদেশে চালান যেত। তৃতীয় শ্রেনীর বা মোটা গড়া ছিল সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য।[১১]

বয়ন শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মজুরি এবং কাঁচামালের মূল্য। মজুরির মধ্যে রয়েছে বুননের জন্য ব্যয়, আয়তন ঠিককরা এবং তাঁতের টানা সুতা তৈরির (টানা এবং দুমড়ানো সহ) জন্য ব্যয়, কাপড়ের পড়েন পাকনোর জন্য ব্যয়, এবং চূরান্ত রূপদানের ব্যয়। মজুরি বাবদ ব্যয় অবশ্য নির্ভর করত কি ধরনের বস্ত্র উৎপাদিত হত তার উপর।[১২] উৎপাদন খরচের ক্ষেত্রে অন্য গুরুত্বপূর্ণ চলক হল সুতার মূল্য। এই মূল্য আবার নির্ভর করত সুতার সূক্ষ্মতার উপর (এবং অন্যকোন উপাদান ব্যবহৃত হলে তার উপর)। রাজ পরিবারের জন্য মসলিন তৈরী করা হত সূক্ষ্মতম সুতো দিয়ে। এই সুতো কাটা হত সম্ভবত ৫০০ কাউন্টের উপর। টেইলরের মতে, সারা মাস ধরে পুরো সকাল মাকুতে কাজ করার পরও একজন সুতো কাটার লোক সর্বোচ্চ মাত্র আধা তোলা পরিমান সুতো কাটতে পারতো।[১৩]

সুতি বস্ত্র বয়নের ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ প্রদান, কাঁচামাল সরবরাহ এবং তৈরি পণ্য বাজারজাত করা সব পর্যায়গুলো সাধারণত মহাজনই করে থাকেন। মহাজনই কাঁচামাল সরবরাহ করেন, অগ্রিম অর্থ প্রদান (দাদন) করেন এবং তৈরি পণ্যগুলি নিজেই গ্রহন করেন। অগ্রিম অর্থ প্রদানের জন্য তিনি কোনো সুদ নেন না, তবে তৈরি পণ্যটি ন্যায্য মূল্যের চেয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনেক কম দামে কিনে পুষিয়ে নেন। তাঁতি তার পণ্য অন্যকারও কাছে বিক্রি করতে পারে না যেখানে সে উপযুক্ত দাম পেতে পারে। যে মহাজন তাঁকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করে সেই মহাজনের সঙ্গে তাঁতি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। মহাজনের কাছে তাঁতি সর্বদা কোনো না কোনোভাবে ঋণী থেকে যায়। যদি তাঁতি মনে করেন চুক্তিবদ্ধ মহাজনের কাছে পণ্যের দাম কম পাচ্ছেন এবং অন্যকারও কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করেন তাহলে, চুক্তিবদ্ধ মহাজন তাঁতির কাছে সমস্ত টাকা একসঙ্গে পরিশোধের দাবি করেন। এই কারণে তাঁতি মহাজন প্রদত্ত পণ্যের দাম নিতে বাধ্য হন। এইভাবে মহাজন তাঁতিদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেন। এরকম ক্ষেত্রে তাঁতি হল মহাজনের কাছে একজন মজুরি-উপার্জনকারী কর্মচারী।[১৪]

বীরভূম জেলার রেশম বয়নে রামপুরহাট মহকুমায় প্রায় ৪০০ পরিবার যুক্ত ছিল। প্রত্যেক পরিবারের গড়ে দুটি করে তাঁত ছিল। এখানে রেশমের কাপড়গুলির মধ্যে প্রধান ছিল চাদর, লম্বা পাগড়ী, এবং কোট তৈরীর জন্য থান কাপড়। আগে কাপড় রং করার পদ্ধতি ভালো জানা ছিল না, তাই মুর্শিদাবাদে তৈরি কাপড়গুলির তুলনায় বীরভূমের কাপড়গুলি নিম্নমানের ছিল। কাপড় তৈরীর জন্য সিল্কের সুতো মালদা জেলা, এবং মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী জয়পুর, ডাঙ্গাপাড়া এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আনা হত। সাধারণত একজন তাঁতি দিনে ১০ ঘন্টা কাজ করে তিনজনের সহায়তা নিয়ে (সাধারণত শিশু ও মহিলা) ৪ থেকে ১০ হাত লম্বা রেশমের কাপড় বুনে ১ টাকা থেকে ১ টাকা ৪ আনা রোজগার করতে পারতো। একজন তাঁতি পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৩০ থেকে ৫০ টাকা। তাঁতিরা খুব পরিশ্রমী ছিল এবং তাদের কোনো ছুটি ছিল না। তাঁতিদের কাঁচামাল সরবরাহ করতেন মহাজনরা এবং তাদের তৈরি কাপড়গুলি মহাজনরাই সংগ্রহ করতেন। কাপড়গুলি সাধারণত মহাজনদের দ্বারা কলকাতা, দিল্লি, লাহোর অন্যান্য জায়গায় প্রেরণ করা হত।[১৫]

লাভপুর এলাকায় রেশম বয়ন শিল্প ছিল ভাবকুটি, আবাদাঙ্গায়, ভোলাস, দুয়ারকি, প্রভৃতি গ্রামে। আবাদাঙ্গায় গঠিত সমবায় সমিতি দুর্বল সংগঠনের জন্য এই শিল্পে আর্থিক সাহায্য দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৫০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে প্রায় ৮৩০ একর জমিতে তুলো চাষ হয়েছিল। একই বছরে বীরভূমের রেশম বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬০০টি এবং তাঁতের সংখ্যা ছিল ৯৭৮টি। 'কোরা' (kora) হল সাধারণ রেশম যা তাঁতিরা নিষ্কাশিত করেন, যেখানে কাঁচা রেশমকে মোটেই ধোলাই করা যায় না। অনুমান করা হয় যে, ১৯৫০ সালে বীরভূমে বার্ষিক রেশম কাপড়ের উৎপাদন ছিল ৯,১৪,৪০০ গজ। বাসওয়া ও বিষ্ণুপুরের মুদ্রিত শাড়ি ছিল ১২ গজ দৈর্ঘ্য ও ৪৫ গজ প্রস্থ এবং পাগড়ির কাপড় ৯ গজ দৈর্ঘ্য ৪০ গজ প্রস্থ কোরা থান বিশেষীকরণ করা হয়েছিল।[১৬]

জেলার কয়লা খনি নিয়েও পুনর্বিচার করা প্রয়োজন। কয়লা খনিতে শ্রম সরবরাহ সবসময় অবিচল ছিল না। স্বল্প মজুরি ও কাজের দুর্বল অবস্থা কিছুটা হলেও এর জন্য দায়ী ছিল। অল্প মজুরি একটি শ্রেণীর বিবর্তনের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। মজুরির হার কাজের প্রতি শ্রমিকদের আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। মজুরি ওঠানামার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা যেতে পারে। এক; প্রায় স্থির একটি পর্যায় (১৯০১-২৫), দুই; তীব্রভাবে মজুরি হ্রাসের পর্যায় (১৯৩০-৩৭), তিন; তীব্রভাবে মজুরি বৃদ্ধির পর্যায় (১৯৩৮-৪৭)।

তাছাড়াও, শ্রমিকদের কাজের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। খনিগুলির অভ্যন্তরে অপ্রতুল বায়ু চলাচলের অসুবিধা, কাজের নির্দিষ্ট সময় না থাকা, সংরক্ষণের অক্ষম ব্যবস্থা শ্রমিকদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকে কয়লাখনির পদ্ধতি ছিল আদিম। পরিচালনায় উদাসীনতা ও অজ্ঞতার কারণে খনিগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকদের মৃত্যু ও গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটত। দুর্ঘটনার আগাম সতর্ক করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯০১ সালের খনি আইন অনুসারে শংসাপত্রপ্রাপ্ত পরিচালক ও সহকারি পরিচালকদের দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রতিদিন তদারকির জন্য বিধি-বিধান করা সত্ত্বেও তারা তাদের দায়িত্বে অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং খনি শ্রমিকদের উপর কখনোই পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেনি। এছাড়াও কিছু কোলিয়ারি মালিক এবং তাদের ছোট কর্মচারীর দ্বারা শ্রমিকদের উপর করা দুর্ব্যবহার ও নিপীড়ন শ্রম সরবরাহকে প্রভাবিত করেছিল। এই ধরনের অন্যায় আচরণের মধ্যে কোলিয়ারি কর্তৃত্বকারীরা শ্রমিকের উপর হামলা, বেতন বন্ধ এবং তাদের উপার্জনের একটি অংশকে প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

এই অমানবিক পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ সময় শ্রমিককে কুলি লাইনে বা অতি ক্ষুদ্র কক্ষে থাকতে হতো। মজুরদের থাকার ব্যবস্থাটি ছিল সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর এবং অনুপযুক্ত। ফলস্বরূপ অস্বাস্থ্যকর কোলিয়ারিতে কলেরা সংক্রামক রোগের

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং স্বাস্থ্য পরিমাপ ব্যবস্থা খুব অল্পই ছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল ছিল না। খননকারীরা ধোয়ার জন্য কয়লার গর্তে জমে থাকা জল ব্যবহার করত।

শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কোনভাবেই স্বাচ্ছন্দ্যজনক ছিল না। তাদের খাবারের তালিকায় চাল, ডাল, মাঝে মাঝে শাকসবজি, ঘি খুবই কম, সপ্তাহে একদিন তেলের খাবার। একজন শ্রমিক যখন একা থাকে তখন তার খাবারের জন্য খরচ করে প্রতিমাসে ৮ টাকা। আর যখন সে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করে তখন খরচ হয় ৬ টাকা। একজন পুরুষ প্রতিমাসে উপার্জন করে ১২ থেকে ১৬ টাকা এবং একজন মহিলা প্রতিমাসে আয় করে ৮ থেকে ১২ টাকা। কখনো কখনো শ্রমিকরা পরিচালকদের কাছ থেকে আগাম নিত। তারা যেভাবে পরিশ্রম করত এই জাতীয় খাবার গুণমান ও পরিমাণে পর্যাপ্ত ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ত।[১৭]

চিনি শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার চিনির চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে উঠানামা করলেও বাংলার অভ্যন্তরে চিনির একটি সুনিশ্চিত বাজার ছিল। ব্যবহৃত চিনি ছিল অত্যন্ত নিম্ন। সারা বাংলায় এই অপরিশোধিত চিনি গুড় নামে পরিচিত ছিল। গ্রামের জনসাধারণ এই ধরণের গুড়ই খেতো। খাদ্য ও পানীয়কে মিষ্টি করার জন্যই যে শুধু গুড় ব্যবহৃত হত তা নয়, একটি প্রধান আহার্যদ্রব্য হিসেবেও এটা ব্যবহৃত হতো। গুড়ের গন্ধ ও স্বাদ ছিল চমৎকার এবং এই গুড় ছিল খুবই পুষ্টিকর। এজন্যে গ্রামের লোকেরা সাদা চিনির চেয়ে গুড় বেশি পছন্দ করত। তবে শহরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গুড়ের ব্যবহার হত। তামাকের সঙ্গে মেশানোর জন্য তামাক ব্যবসায়ীদের কাছেও গুড়ের চাহিদা ছিল প্রচুর। যারা সুরা তৈরি করত তাদের কাছেও গুড়ের চাহিদা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তুলনামূলকভাবে গুড় ছিল সস্তা। এসব কারণে বহুল পরিমাণে গুড়ের উৎপাদন এবং ব্যবহার অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকে চিনি তৈরির জন্য শোধনাগারে খুবই কম গুড় ব্যবহার করা হত। আশা করা হয়েছিল যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে চা পানের অভ্যেস বাড়লে, মিষ্টির ব্যবসায়ে গুড়ের পরিবর্তে চিনির ব্যবহার হতে থাকলে এবং চিনিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে গুড়ের ব্যবহার ক্রমশ কমে যাবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিসংখ্যানে পূর্ববর্তী ধারণারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এই বছর মাথাপিছু ব্যবহৃত মোট ২৫ পাউন্ড চিনি ও গুড়ের মধ্যে গুড়ের ভাগ ছিল ১৮.৫ পাউন্ড ও চিনির ভাগ ছিল মাত্র ৬.৫ পাউন্ড। দেশের জনগণের বৃহৎ অংশের মধ্যে গুড়ের প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর হওয়ায় গুড় শিল্পের ক্রমোন্নতি হতে থাকে।[১৮]

গ্রামীন শিল্প বলতে প্রায় অবিচ্ছিন্ন কুটির শিল্পকে বোঝায়, যেগুলি বেশিরভাগ ঘরোয়া পর্যায়ে রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই এই শিল্প পরিচালিত হয়। শিল্পের যন্ত্রপাতিগুলির মালিক স্বয়ং কারিগর। কোন কোন সময় কারিগররা নিজেদের পুঁজি নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। তবে বেশিরভাগ সময় তারা কোন এক মহাজনের অধীনে দাস হিসেবে থাকে, যে মহাজনরা কাঁচামাল সরবরাহ করেন এবং অগ্রিম অর্থ প্রদান করেন। তৈরি পণ্যটি পূর্বনির্ধারিত অল্প দামে মহাজনরাই লাভ করে থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে একজন মনিব নিজের বাড়িতে বা ভাড়াটে কারখানায় ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে ব্যবসায়ের আয়োজন করে থাকেন। তবে এখানেও কর্মশালা বা কারখানার মালিক একটি নিয়মের মাধ্যমে একজন পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর অধীনে থাকেন যিনি তাকে অর্থ প্রদান করেন এবং পণ্যগুলি বাজারের জন্য প্রস্তুত হলে তা ক্রয়ের জন্য একচেটিয়ার অধিকারী হন।[১৯] তবে জেলার গালা-বার্ণিশ পণ্যগুলির ক্ষেত্রে কাঁচামাল পার্শ্ববর্তী উসাদিন, নন্দর, কানপুর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হত। অবশ্য পাত-গালা মহাজনদের মাধ্যমেই কলকাতার বাজারে পাঠানো হত এবং তৈরি খেলনাগুলি আশেপাশের বাজারে বিক্রি করা হত। পরবর্তীকালে গালার পণ্যগুলি বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং সংবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাবের জন্য যারা এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা বাধ্য হয়েছিল নিজেদের জীবিকার জন্য অন্য কাজে নিযুক্ত হতে। এই প্রসঙ্গে শ্রী গোপালচন্দ্র গুই এর নাম উল্লেখ করা যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীনিকেতন হস্তশিল্প ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষক ছিলেন। শ্রী গুই এই শিল্পের ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতার দক্ষতার ভিত্তিতে বলেন, এই শিল্পের পুনর্জীবন সম্ভব যদি এই শিল্পে ইচ্ছুক যুবকরা সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পায় এবং সঠিক পরিকল্পনা করে সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়।[২০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইংরেজদের আগমন ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় লোহা শিল্প নষ্ট হতে লাগে। যদিও ১৮৭২ সালেও বীরভূম জেলায় ৭২টি লোহার 'শাল' বা উনুনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আসা শুরু হলে কামারের শিল্প নষ্ট হয়। সুতরাং কামারদের অন্য শিল্পের আশ্রয় গ্রহন করতে হয়। যারা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি তৈরি করত তাদের একই অবস্থা হয়; যারা কোদাল, কুড়ুল প্রভৃতি তৈরি করত তাদের কাজ গেল ঢালাই লোহার বিলাতীমাল আমদানির সঙ্গে।[২১] ছুরি ও কাঁচির শিল্পটি কামারদের দ্বারা পরিচালিত হলেও পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক হিন্দু এই শিল্পে অংশ নিয়েছিল। ১৯০৭ সালে ওয়াটসনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা ছুরি কাঁচির দোকানে নিষ্পেষণ ও মসৃণতার কাজে যুক্ত ছিলেন। ফলস্বরূপ সময়ের সাথে সাথে এই শিল্পে কর্মকারদের একচেটিয়া চলে যায়। তবুও ছুরি কাঁচির ব্যবসা বাংলায় পুরোপুরি বর্ণভিত্তিক এবং একটি ছোট কুটির শিল্প হিসাবেই পরিচালিত হয়েছিল।[২২]

সারণী ১.১: বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত দৈনিক কর্মীর গড় সংখ্যা

বছর	যন্ত্রবিদ্যা	খাদ্য, পানীয়, তামাক	রাসায়নিক পদার্থ, রং ইত্যাদি	কাঠ	মোট
১৯৪০	-	১,৯৬২	৭৫	২৫	২,০৬২
১৯৪১	-	১,৮১৯	১০৭	৩৬	১,৯৬২
১৯৪২	-	১,৯৬৯	১১৭	২৩	২,১০৯
১৯৪৩	-	১,৭৩৬	১৩২	২৬	১,৮৯৪
১৯৪৪	-	২,০৭২	১২৬	৪	২,২০২
১৯৪৫	-	২,৫৩৩	৪৩১	২৮	২,৯৯২
১৯৪৬	-	২,৬২৩	৪২৮	২৬	৩,০৭৭
১৯৪৭	-	২,৭৫৩	৩৩২	৬২	৩,১৪৭
১৯৪৮	৮২	২,৬৭৬	৩২২	৪৮	৩,১২৮
১৯৪৯	৩০	২,৫৩২	৩০৬	৫৫	২,৯২৩

উৎস : অশোক মিত্র, সেনসাস রিপোর্ট ১৯৫১, বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৫৪, পৃ. ১১

সারণী ১.২ : জেলার মহকুমা অঞ্চলে ছোট-মাপের শিল্প প্রতিষ্ঠান

শিল্পের নাম	মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিযুক্ত কর্মী					
		১৮ বছর বা তার উর্ধ্বে		১৫ থেকে ১৮ বছর		১৪ বছর বা তার নিচে	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
আটা পেষন	২	৫	-	-	-	-	-
পাউরুটি ও বিস্কুট তৈরি	৫	২২	-	১	-	-	-
তেল তৈরি	১৬	৩২	২৩	-	-	-	-
বিড়ি তৈরি	৩২	৯৩	২	৪৯	-	১১	-

সেলাইয়ের কাজ	১৫	২৪	-	-	-	-	-
চর্ম সংস্কার	২	৫	-	-	-	-	-
জুতো তৈরি ও মেরামত	৮	১৯	-	-	-	-	-
কামার শালা	৫৬	১০৬	-	৮	-	-	-
পিতল, কাঁসা ও তামা তৈরি	১১	১৬	-	৩	-	-	-
সাইকেল মেরামত	৩	৫	-	-	-	-	-
গাড়ীর চাকা তৈরি	৩	৩	-	-	-	-	-
সোনা, রুপার অলংকার তৈরি	২৯	৫৩	-	১	-	১	-
মৃৎ শিল্প তৈরি	৫১	৭৩	৩৮	৩	-	-	-
তক্ষণ শিল্প	৬৭	১১০	-	৪	-	১	-
বাঁশের পণ্য তৈরি	২৩	২৭	২৮	-	-	-	-
মোট	৩২৩	৫৯৩	৯১	৬৯	-	১৩	-

উৎস: অশোক মিত্র, সেনসাস রিপোর্ট ১৯৫১, বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৫৪, পৃ. ১১৪

উপসংহার : ঔপনিবেশিক আমলে (১৮৫৫-১৯৪৭) বীরভূম জেলার শিল্পজগৎ ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধি সম্পন্ন, যা কৃষিপ্রধান অর্থনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিল; সুতি-রেশম বয়নশিল্প (ইলামবাজারের অতিমিহি গড়া কাপড়, রামপুরহাটের চাদর-পাগড়ি-কোট থান, লাভপুর-আবাদাঙ্গার কোরা রেশমী থান), কয়লাখনি (শ্রমিকদের কষ্টকর পরিবেশ সহ), চিনি-গুড় উৎপাদন (গ্রামীণ খাদ্য ও বাজারের স্থায়ী চাহিদা), লোহা-আয়রন স্মেল্টিং (৭২টি শাল বা উনুন), গালা-বার্ণিশ খেলনা, ছুরি-কাঁচি-কোদাল তৈরি, চর্মশিল্প, পিতল-কাঁসা ও মৃৎশিল্প ইত্যাদি কুটির ও আংশিক কারখানাভিত্তিক শিল্প জেলাকে বাণিজ্যিক-শিল্প কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল, যা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনন্য ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাদনি-এজেন্সি ব্যবস্থা, গোমস্তা-মহাজন-পাইকারদের নির্মম শোষণ (অগ্রিম ঋণের ফাঁদ, নিম্নমূল্যে পণ্য গ্রহণ, শারীরিক নির্যাতন, রেজিস্ট্রি করে ক্রীতদাসের মতো বন্দীকরণ), স্বল্প ও অস্থির মজুরি (কয়লাখনিতে ১২-১৬ টাকা/মাস), অমানবিক কাজের পরিবেশ (খনির অপর্যাপ্ত বায়ু-জল, দুর্ঘটনা, কলেরা-রোগ), বিদেশি আমদানি (ব্রিটিশ ঢালাই লোহা, মেশিনমেড পণ্য, ম্যানচেস্টার কাপড়) এবং প্রতিযোগিতার কারণে এসব শিল্প ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়— তাঁতিরা পেটের ভাতের জন্য কৃষি বা অন্য কাজে আশ্রয় নেয়, কামার-কুমাররা শিল্প পরিত্যাগ করে, যদিও রেশমবয়ন (৯ লক্ষ গজ/ বছর), গুড়শিল্প (মাথাপিচু ১৮.৫ পাউন্ড) এবং কয়েকটি কুটিরশিল্প আংশিকভাবে টিকে থাকে, শ্রমিক-কারিগরদের জীবনযাত্রাকে চরম কষ্টকর করে তোলে। এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা স্থানীয় ইতিহাসের মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে, আগের গবেষকদের (হান্টার, গুপ্ত, মিত্র, রায়, চক্রবর্তী, ঘোষ, মজুমদার) কাজকে নতুন দিক যোগ করে এবং বর্তমানে বীরভূমের শিল্প-ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার পথ দেখায় সরকারি আর্থিক সহায়তা, যুবকদের প্রশিক্ষণ (যেমন গোপালচন্দ্র গুইয়ের মতো বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো), সমবায় সমিতির মজবুতি, পরিকল্পিত পুনরুদ্ধার এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কুটির শিল্পগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা সম্ভব, যা বাংলার সামগ্রিক শিল্প ইতিহাসকে নতুন মাত্রা প্রদান করবে এবং কৃষি-শিল্পের সামঞ্জস্য স্থাপনে সহায়তা করবে।

Reference:

১. দত্ত, অচিন্ত্য কুমার, ইকোনমি এ্যান্ড ইকোলজি ইন এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট: বার্ডওয়ান, ১৮৮০-১৯৪৭, কোলকাতা, ২০০২, পৃ.১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 993 - 1001
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. ভট্টাচার্য, মিহির ও দীপঙ্কর ঘোষ, বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৯
৩. মিত্র, গৌরীহর, বীরভূমের ইতিহাস, পার্থশঙ্খ মজুমদার (সম্পাদিত), কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৫৩
৪. কুমার, ধর্মা, (সম্পাদিত), দ্য কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভলিউম-২, ১৭৫৭-১৯৭০, নিউইয়র্ক, ১৯৮৩, পৃ. ২৮৪-৮৫
৫. ইসলাম, সিরাজুল, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭৪০-১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২৭
৬. সিনহা, জে. সি., দ্য ইকোনমিক অ্যানালস অব বেঙ্গল, লন্ডন, ১৯২৭, পৃ. ৭৯-৮০
৭. মিত্র, বিজয় দেবেন্দ্র, দ্য কটন উয়েবারস অব বেঙ্গল (থিসিস) ১৭৫৭-১৮৩৩, ক্যালকাটা, ১৯৭৫, পৃ. ৬২
৮. মিত্র বিজয়, দেবেন্দ্র, ঐ, পৃ. ৬৩-৬৪
৯. মার্চেন্ট, উইলিয়াম বোল্ডস, কনসিডারেশনস অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স, লন্ডন, ১৭৭২, পৃ. ১৯৩
১০. মিত্র, দেবেন্দ্র বিজয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪
১১. গুপ্ত, রঞ্জন, রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গনবিদ্রোহ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ২০১
১২. ইসলাম, সিরাজুল, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭৪০-১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩৬
১৩. সিনহা, জে. সি., 'দ্য মসলিন ইন্ডাস্ট্রি অব ঢাকা' ইন দ্য মডার্ন রিভিউ, এপ্রিল, ১৯২৫, পৃ. ৪০৩
১৪. সাহা, কে. বি. সাহা, ইকোনমিক্স অব রুরাল বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৩০, পৃ. ১৬৩-১৬৪
১৫. ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, বীরভূম, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৭৫, পৃ. ২৪৩
১৬. মিত্র অশোক, সেনসাস রিপোর্ট ১৯৫১, বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৫৪, পৃ. xiii
১৭. দত্ত, অচিন্ত্য কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯১
১৮. গান্ধী, এম. পি., দ্য ইন্ডিয়ান সুগার ইন্ডাস্ট্রি, বোম্বাই, ১৯৩৪, পৃ. ৩০, ৫৫, ৬৬
১৯. সাহা, কে. বি., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪
২০. মজুমদার, দুর্গাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭
২১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, বঙ্গ পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ. ৫২০-৫২১
২২. অচিন্ত্য কুমার দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২